সংগঠন প্রসঙ্গে

মুস্তফা হুসাইন

اَلَّذِيۡنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدۡ جَمَعُوۡا لَكُمۡ فَاخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ اِيۡمَانًا ۖ وَّ قَالُوۡا حَسۡبُنَا اللّٰهُ وَ نِعۡمَ الۡوَكِيۡلُ

যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল যে, ‘নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর’। কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক’!

(সূরা আলি ‘ইমরান, ৩:১৭৩)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَ اُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ‌ۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِىۡ شَىۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ‌ؕ ذٰلِكَ خَيۡرٌ وَّ اَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর। (সূরা নিসা, ৪:৫৯)

وَ اَوۡفُوۡا بِعَهۡدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدۡتُّمۡ وَ لَا تَنۡقُضُوا الۡاَيۡمَانَ بَعۡدَ تَوۡكِيۡدِهَا وَ قَدۡ جَعَلۡتُمُ اللّٰهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيۡلًا‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُوۡنَ

ؕ وَ لَا تَكُوۡنُوۡا كَالَّتِىۡ نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۡۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ اَنۡكَاثًا‌ ؕ تَتَّخِذُوۡنَ اَيۡمَانَكُمۡ دَخَلًا بَيۡنَكُمۡ اَنۡ تَكُوۡنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرۡبٰى مِنۡ اُمَّةٍ‌ ؕ اِنَّمَا يَبۡلُوۡكُمُ اللّٰهُ بِهٖ‌ ؕ وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ مَا كُنۡتُمۡ فِيۡهِ تَخۡتَلِفُوۡنَ

“আল্লাহর নামে অঙ্গিকার করার পর সে অঙ্গিকার পূর্ণ কর। পাকাপাকি কসম করার পর সে কসম ভঙ্গ করো না- যখন তোমরা আল্লাহকে নিজেদের উপর সাক্ষী করেছো। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। তোমরা ঐ মহিলার মতো হয়ো না, যে মজবুতভাবে সূতা পাকানোর পর তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে।” (সুরা নাহল, ১৬: ৯১-৯২)

দীনের কর্তৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যে তাজদিদি আন্দোলনের রূপরেখা, আদর্শিক ন্যারেটিভ এবং আদর্শিক ব্যাক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের দ্বারা আন্দোলন দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি এখনও। কেন হয়নি এই প্রশ্নের উত্তরে মৌলিক কিছু কারণ উঠে আসবে। এখানে আমরা

যে কারণ নিয়ে কথা বলতে চাই-

আমাদের সাংগঠনিক মেহনত নেই। সংগঠন নেই যা ধারাবাহিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচির ভেতর দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলবে। বাস্তবিক প্রেক্ষাপট বুঝে স্টেপ নেয়ার ক্ষেত্রে আমরা ডিসিপ্লিন্ড, ধারাবাহিক ও নেতৃত্বের অনুগত হয়ে কাজ করে যাব এই নজরানা বিরল।

একক কাজ করা, ছোট ছোট গ্রুপ, কমিটি, ইউনিট করে কাজ করে যাওয়ার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা আমাদের আছে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু সাংগঠনিক কাঠামো, সংস্কৃতির মাঝে থেকে সংগঠক হওয়ার মেজাজ ধারণ করা আমাদের মাঝে কিছুটা অনুপস্থিত। গ্রাম-ইউনিয়ন, জেলা-উপজেলা, শহর-বিভাগ থেকে নিয়ে দেশব্যাপী কাজ করে সংগঠনকে সুদৃঢ় করার অভিজ্ঞতা বলি আর দক্ষতা বলি, তার সংকট আছে আমাদের মাঝে।

যদিও সংগঠন উদ্দেশ্য, লক্ষ্য কিংবা মাকসাদ নয়। বরং শারিয়াহ শাসন ব্যাবস্থা সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তবে সংগঠন এলক্ষ্য বাস্তবায়নে অনিবার্য মাধ্যম বটে।

তবে আমাদেরকে শুন্য থেকে শুরু করা লাগবে। এতে দরকার হবে সততা, তাক্বওয়া, মুহাসাবা, ডিসিপ্লিন্ড, ধারাবাহিক কাজের জন্য আত্মত্যাগ ও আনুগত্যশীলতা।

এপর্যায়ে সংগঠনের গতিশীলতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতের লক্ষ্যে শ্রবণ-আনুগত্যসহ সাংগঠনিক মূলনীতি সংক্রান্ত কিছু বিষয় তুলে ধরা হবে।

শায়খ উমার আব্দুর রহমান সম্পাদিত মিসাকু আমালিল ইসলামি বইয়ে বলা হয়েছে-

> শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত একটি সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া আমাদের লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব। আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের অনেক বিধান দলবদ্ধ না হয়ে একাকী আদায় করা অসম্ভব শরীয়ত বলে, একটি ফরয পালনের জন্য যে উপায়-উপকরণ অপরিহার্য, সেটি অর্জন করাও ফরয। আমাদের আদেশ করা হয়েছে ভালো কাজ, তাকওয়া ও আল্লাহর রজ্জু ধরার ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য করার জন্য। আমরা আরো দেখিয়েছি যে, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা ফরযে আইন, যা একজন মুসলিমও অবহেলা করতে পারবে না।
>
> অতএব, সম্মিলিত প্রচেষ্টা হলো ইসলামি আন্দোলনের একটি জরুরি ভিত্তি। এর ফলে শক্তি বজায় থাকে। অন্যথায় ছাড়া ছাড়া হয়ে এলমেলো কাজ করলে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এটাও ভাবতে হবে যে, যেমন তেমন একটা দল গড়ে তুললেই লক্ষ্য অর্জন হবে কি না। অন্য কথায় বললে, দল গঠনের এমন কোনো পদ্ধতি কি আছে,যেভাবে দল গড়লে উল্টো দুর্বলতাই বৃদ্ধি পাবে? মুসলিমদের এমন কোনো ফিরকা কি আছে, যাদেরকে বর্জন করাটাই আখেরে অধিক কল্যাণকর?

রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, সহীহ বুখারীর মধ্যে এসেছে, আলি ইবনে আবি তালিব রা: থেকে বর্ণিত:

"নিশ্চয়ই আনুগত্য হয় কেবল ন্যায়সঙ্গত কাজে।"

আমিরের আনুগত্যের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাবে সে সময়, যখন একজন ব্যক্তি একটি বিষয় অপছন্দ করে, সে একটি বিষয়কে ভালবাসে না, তা তার নিকট অপছন্দনীয়। এজন্যই আনুগত্য পছন্দে ও অপছন্দে।

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আরেক হাদিসে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করল। আর যে আমীরের (নেতার) আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমারই অবাধ্যতা করল।

প্রকৃতপক্ষে ইমাম (নেতা) হলেন ঢাল স্বরূপ।"

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসসালাম একই হাদিসেই আরো বলেন-

সুতরাং আমির যদি আল্লাহর প্রতি ভয়প্রদর্শন পূর্বক প্রশাসন চালায় এবং ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে এর বিনিময়ে সে সাওয়াব (প্রতিদান) পাবে। কিন্তু সে যদি এর বিপরীত কর্ম সম্পাদন করে, তাহলে তার গুনাহও তার ওপর কার্যকর হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

যেমন সহীহ মুসলিমে এসেছে, আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত, রাসূল সা: বলেন:

"তোমার উপর আনুগত্য করা আবশ্যক তোমার বিপদে ও সুখে, পছন্দে ও অপছন্দে এবং তোমার উপর কাউকে প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও।"

আসলে ভাই, শ্রবণ-আনুগত্যের ক্ষেত্রে যা না বললেই না, তা হচ্ছে- পছন্দের সময় আনুগত্য করা সহজ। কিন্তু অপছন্দের সময়, যখন কোন বিষয়কে সে ভালবাসে না, তার প্রতি তার আগ্রহ ও আসক্তি নেই, সে সময় ফুটে উঠে প্রকৃত আনুগত্য এবং আমিরের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর স্পষ্ট ইবাদত। যেখানে নিজের কোন আসক্তি নেই, নেই নিজের কোন আগ্রহ। বরং মন তাকে কঠিন মনে করে।

আর বাস্তবতাও এটাই যে, ভুলত্রুটি হবেই। একসাথে চলতে গেলে নফসের বিরুদ্ধে অনেক কিছু আসেই। গাফিলতি থেকেও বাড়াবাড়ি হতে পারে। এজন্য আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে, দীন ও জামাতের সামগ্রিক মাসলাহাত মাথায় রেখে ব্যাক্তিগত অনুভূতি ও মতামতের আমাদের হয়তো ছাড় দেয়া লাগবে ভাই। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তো অনেক কিছুই ছেড়েছি দীনের স্বার্থে। আশা করি সামনেও আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জায়গাগুলোতে সমন্বয় সাধন করে, বিবাদ-বিভাজন এড়িয়ে আখিরাত পর্যন্ত সফর জারি রাখতে পারব। আল্লাহ তা আলা তাওফিক দেন।

আরেকটা বিষয়। তা হলো- আমাদের উলামারা বলেছেন-

> মুসলমানের হক নষ্ট করা, তাদের স্বাধীনতা খর্ব করা - ঐক্য সৃষ্টির ও অনৈক্য দূর করার কোন মাধ্যম নয়।
>
> ঐক্য তো আসবে মুসলমানের সামনে বিনয়ী হওয়ার দ্বারা, তাদের খেদমত করার দ্বারা, তাদেরকে সম্মান করার দ্বারা, তাদের মাঝে আস্থা ফিরিয়ে আনার দ্বারা।

এপর্যায়ে সংগঠন সংক্রান্ত কিছু মূলনীতি তুলে ধরছি যা আমাদের উলামায়ে কেরামদের থেকে সংকলিত আলহামদুলিল্লাহ। ইমারাহ বা নের্তৃত্ব দুই ধরণের। একটি হচ্ছে খিলাফাহ, অপরটি খাস বা সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রের ইমারাহ। খিলাফাহর আহকাম ব্যাপকভাবে সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে। সেটাও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের সংগঠন দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা বিশেষ ইমারাহ। যাতে আলহামদুলিল্লাহ আমরা স্বেচ্ছায়, বুঝেশুনে যোগ দিয়েছি। তাই খিলাফাহর স্তরে না হলেও, আমাদের পারস্পরিক এই দায়বদ্ধতার দাবী মেনে চলা শরঈভাবে ওয়াজিব।

ইবনে আবিল ইয আল হানাফি রহ. বলেন,

> “কুরআন, সুন্নাহ এবং সালফে সালেহীনদের ইজমা এটাই প্রমাণ করে যে, আমীর, নামাজের ইমাম, বিচারক, যুদ্ধের আমীর, সদাকা বা যাকাত উত্তলনের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে স্বস্থানে অনুসরণ করতে হবে।
>
> কিন্তু তাদের অনুসারিদের অনুসরণ করা জরুরী না বরং স্বস্ব ক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করতে হবে এবং নিজ সিদ্ধান্তকে তার সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিতে হবে।
>
> নিশ্চয় জামাআতের কল্যাণ অকল্যাণ ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে অনেক বড়। আর এ কারণেই এক হাকীম অন্য হাকীমের হুকুম বাতিল করা জায়েয নেই।”
>
> -শরহুত তাহাবী : ৩৭৬

তামীম দারী বলেন,

> “উমার ইবনে খাত্তাবের যুগে মানুষেরা দালানকোঠা নিয়ে গর্ব করতে আরম্ভ করেছিল। তখন তিনি বলেন, ‘হে আরববাসী! ভূমি ভূমি! (অর্থাৎ দালানকোঠার প্রতি মনোযোগী না হয়ে ভূমির কাছাকাছি থাকো)
>
> নিশ্চয়ই জামাত ছাড়া ইসলামের কোনো মূল্য নেই। নেতৃত্ব ছাড়া জামাতের কোনো মূল্য নেই। আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্বের কোনো মূল্য নেই। শুনে রাখো! যাকে তার সম্প্রদায় বুঝে-শুনে নেতা বানাবে, তার এই নেতৃত্ব তার নিজের জন্য এবং তাদের সকলের জন্য জীবনীশক্তি হবে।
>
> আর যাকে তার সম্প্রদায় না বুঝে-শুনে নেতা বানাবে, তার এই নেতৃত্ব তার নিজের জন্য এবং তাদের জন্য ধ্বংসের কারণ

হবে।”

ইমাম আওযা'য়ী বলেন,

“বলা হয়, মুহাম্মাদ ? -এর সাহাবী ও তাবেঈগণ পাঁচটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন: (১) জামাতের সঙ্গে জুড়ে থাকা, (২) সুন্নাহ অনুসরণ, (৩) মসজিদ নির্মাণ, (৪) তেলাওয়াতে কুরআন এবং (৫) জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ”।

বিশেষ জামাতবদ্ধতা বা সংগঠনের ক্ষেত্রে আহকাম/বিধান কুরআন সুন্নাহর দলীল ও আইম্মায়ে কেরামের ভাষ্য থেকে যা যা আলহামদুলিল্লাহ প্রমাণিত হয়:

- দীন কায়েমের জন্য খাস ইমারত তথা সংগঠন গড়ে তোলা বৈধ। বরং দীন কায়েমের এই ফরয দায়িত্ব যখন তানজীম গঠন ছাড়া আদায় করা সম্ভব নয়, তখন তা আবশ্যক।

- সংগঠনের সদস্যদের পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যাদেরকে দায়িত্বশীল নির্ধারণ করা হবে, তারা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেও আমীর গণ্য হবেন এবং তাদের আনুগত্য জরুরী।

- কোনো সংগঠনের নিয়ম কানূন কোনো ব্যক্তির উপর ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তাবে না, যতক্ষণ না সে উক্ত সংগঠনের সদস্য হয়।

- সংগঠনের দায়িত্বশীলের নেতৃত্ব সংগঠনের লক্ষ্য ও কাজের পরিধির মাঝে সীমাবদ্ধ। এর বাইরে তার নেতৃত্ব নেই।

- সংগঠনের কাজের পরিধি যতটুকু, ততটুকুতে তার আনুগত্য ফরয। অন্যান্য বিষয়ে ফরয নয়।

- শরয়ী কোন ওজর ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে সংগঠনের দায়িত্বশীলদের আদেশ নিষেধের বিপরীত করা বা কোন ওজর ছাড়াই সংগঠন ছেড়ে চলে যাওয়া নাজায়েয। এমনটা করতে হলে আলোচনা করে সম্মতি নেয়া উচিৎ।

এ হলো সংগঠনের ব্যাপারে মৌলিক কথা। তবে এখানে কিছু বিষয় লক্ষণীয়-

- দায়িত্বশীলদের আনুগত্য ফরয হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তারা নিজেদের ইচ্ছামতো যেভাবে চান সেভাবেই চালাবেন। তাদের ঐ সকল বিষয়েই কেবল আনুগত্য, যেসকল বিষয় শরীয়তের বিপরীত নয়। অধিকন্তু তারা স্বেচ্ছাচারিতার সাথে আদেশ নিষেধ দেবেন না; পরামর্শ সাপেক্ষে দেবেন।

- দায়িত্বশীলরা ভাইদের অবস্থা লক্ষ রেখে আদেশ-নিষেধ দেবেন। সকলের তবিয়ত এক নয়। সবাই সব কাজের যোগ্যও নয়। প্রত্যেকের তবিয়ত ও যোগ্যতা অনুযায়ী আদেশ নিষেধ দেবেন, যাতে মানতে সহজ হয়।

- কোন দায়িত্বশীল যদি মামূরদের উপর অহেতুক কঠোরতা করে, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদদোয়া

করেছেন, আল্লাহ তাআলা যেন ঐ আমীরের উপর কঠোরতা করেন। এ জন্য নম্রতা, ভদ্রতা ও কোমলতার সাথে দরদ নিয়ে আদেশ নিষেধ দেয়া চাই।

- আচরণ এমন হওয়া চাই, যাতে কেউ বিগড়ে না যায়। বিশেষ করে বর্তমান দুর্বল হালতে বিষয়টি বড়ই লক্ষণীয়। দারুল হারবে কোন ভাই কোন অপরাধ করে ফেললে তার উপর হদ কায়েম করতেও নিষেধ করা হয়েছে। যাতে সে বিগড়ে না যায়। জিদ বশত কাফেরদের সাথে গিয়ে যোগ না দেয়।

আমাদের বর্তমান হালতে কোন সাথী বিগড়ে গেলে অনেক মুসিবত পোহাতে হতে পারে। অতএব, আচরণে নম্রতা রাখা চাই। প্রয়োজনে অধিকারে কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও ঐক্য বজায় রাখা জরুরী। কিন্তু যে ভাইরা এর সুযোগ নিবেন তাদেরকে সংগঠন ত্যাগের স্বাধীনতা দেয়াই উত্তম হবে।

- যে কেউ সংগঠনে যোগ দিলেই যে তাকে সংগঠনের সব মেনে নিতে হবে, এমনটা জরুরী নয়। কেউ যদি সংগঠনে বিশেষ কোন শর্তসাপেক্ষে ঢুকে থাকে, তাহলে তার উপর সংগঠনের কেবল ততটুকুতেই কর্তৃত্ব। এর বেশি নয়। উদাহরণত, কোন ভাই যদি এ শর্তে ঢুকে থাকেন যে, তিনি দৈনিক এক ঘণ্টা করে সময় দেবেন, তাহলে তাকে এর বেশি চাপ দেয়া যাবে না। কারণ, এর বেশি তিনি নিজের উপর ইলতিজাম ও আবশ্যক করেননি। আর যে যতটুকু কর্তৃত্ব আমাদের দিবেন সংগঠন তার জন্য ততটুকুই তো দায়িত্ব আদায় করতে সক্ষম। আর আত্মত্যাগ ও কুরবানি সেচ্ছায় ও সন্তুষ্টির মাধ্যমেই হয়। জোরাজুরি এখানে ভালো ফলাফল আনেনা।

- তবে সামগ্রিক কল্যাণের বিষয়াদি সকলের জন্যই মানা জরুরী। কেননা, এটা সরাসরি শরীয়ত কতৃক নির্ধারিত ফরয। আমি যতটুকু পারি আমার সামর্থ্যানুযায়ী সংগঠনে সময় ও শ্রম দিয়ে উপকার করবো। কিন্তু সংগঠনের কোন ক্ষতি করা কিছুতেই বৈধ নয়।

একজন সাধারণ মুসলমানের কোন ক্ষতি করার অধিকারও কোন মুসলমানের নেই। শরীয়তে নিষেধ। অতএব, সংগঠন ও তার ভাইদের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট থাকা সকলের জন্যই আবশ্যক। এসব ঠিক রেখে যে যতটুকু পারেন কাজ করবেন।

- সংগঠনে সকল দায়িত্বশীলের ক্ষমতা সমান নয়। যাকে যে বিভাগে যে বিষয়ে যতটুকু ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তিনি কেবল ততটুকুতেই কর্তৃত্ব করতে পারবেন। এর বেশি নয়।

শাইখ আব্দুল হাকিম হাসসান ‘হিদায়াতুল মুজাহিদীন ইলা ওয়াসিয়্যাতিন নাবিয়্যিল আমীন’ নামক তাঁর অনবদ্য গ্রন্থে জামাত সম্পর্কে লিখেছেন,

কেউ কেউ বলেন, জামাতের উদ্দেশ্য হলো- সত্য পথ ও আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, যদিও একজন ব্যক্তির মাধ্যমেই তা হয়।

কারণ, অনুসরণ তো কেবল সত্য পথেরই হওয়া উচিত, অন্য কোনো কিছুর নয়।

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ রহ. বলেছেন,

যে ব্যক্তি কোন জামাতের সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং পৃথিবীর কোন দিকে, কোন দেশে, কোন অঞ্চলে, কোন জামাতের আওতাভূক্ত হবে তখন তার জন্য জরুরী হল ঐ জামাতের সাথে লেগে থাকবে, তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। চাই সে তার কাছে সরাসরি বায়াহ দিক অথবা না দিক।

শুধুমাত্র ঐ জামাতের আওতাভূক্ত হওয়ার কারণেই তার কথা শুনা ও তার আনুগত্য করা লাজেম বা আবশ্যক হয়ে গেছে। সেখান থেকে বের হওয়া বা নতুন কোন জামাত গঠন করা জায়েয নেই।

ফুকাহায়ে কেরামদের অনুমদিত শরয়ী গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ছাড়া নতুন দল গঠন করা জায়েয নেই। কোন জামাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অথবা জামাত থেকে পৃথক হয়ে নতুন কোন জামাআত গঠন করা জায়েয নেই।

তবে ফুকাহায়ে কেরামদের অনুমদিত শরয়ী গ্রহণযোগ্য কোন কারণ থাকলে জামাত থেকে পৃথক হওয়া যেতে পারে। আল্লাহ ভাল জানেন।

শায়খ সামি আল উরাইদি হাফিজাহুল্লাহ বলেন,

"যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে কোন আমীর অথবা জামাতকে বায়াহ দিল অতপর জামাতের ব্যাপারে অথবা জামাতের কোন সদস্যের ব্যাপারে সামান্য কোন ইঙ্গিত শুনতে পেল। অথবা কোন স্থানে জামাতের কোন তয়েফা জামাত থেকে পৃথক হওয়া অথবা ভিন্ন দল গঠন করার সংবাদ পেল তো ব্যাস বায়াহ ছেড়ে দিল এবং বায়াহ ভেঙ্গে দিল।

আরে ভাই!

তোমার তো উচিত তুমি বিষয়টি জামাতের আমীরের কাছ থেকে যাচাই করবে এবং ভালভাবে নিশ্চিত হবে। কারণ বায়াহ তো তার সাথে সঙ্ঘঠিত হয়েছে সুতরাং তোমার দায়িত্ব ও তোমার উপর ওয়াজিব হল তোমার বায়াহ ও অঙ্গিকার পূর্ণ করা।

আর যতক্ষণ না তুমি তোমার আমীরের কাছ থেকে বিষয়টি ভালভাবে যাচাই বাছাই করে নিশ্চিত হবে ততক্ষণ তোমার জন্য বায়াহ ভঙ্গ করা জায়েয নেই। যেমনিভাবে বায়াহ দিয়েছিলে তেমনিভাবে বায়াহ ভঙ্গ হবে নিশ্চয়তার সাথে এবং যেমনিভাবে বায়াহ সঙ্ঘঠিত হয়েছিল সেচ্ছায় ও সন্তুষ্টির সাথে এবং উভয় দিকের ঐক্যমতের ভিত্তিতে তেমনিভাবে বায়াহ ভঙ্গ হবে সেচ্ছায় ও সন্তুষ্টির সাথে এবং উভয় দিকের ঐক্যমতের ভিত্তিতে।

সুতরাং তুমি খেয়াল খুশি মত ধারণাবশত কৌশল প্রতারণা ও ধোকার মাধ্যমে বায়াহ ভঙ্গ করো না।”

শায়খ ডক্টর সামি আল উরাইদি হাফিজাহুল্লাহ বলেন,

"আমি এখানে আমার নিজেকে এবং আল্লাহর পথে আমার সকল ভাইকে উপদেশ দেবো, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামতের ভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা যেন আমাদের প্রচেষ্টাকে দ্বীনের শত্রুদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একযোগে ও সমন্বিতভাবে কাজে লাগাই। মুসলিম জাতির ইতিহাসের এহেন সংকটাপন্ন মুহূর্তে এটিই সর্বপ্রধান কর্তব্য।

তবুও যদি কখনও নিজেদের মধ্যকার কোন সমস্যা নিয়ে কথা বলতে হয়, কোন সংশয় নিরসন করতে হয়, তবে যেন আমরা প্রয়োজন পরিমাণে তা করে ক্ষান্ত দেই।

কারণ, কুফরি শক্তির টার্গেট আমরা সকলেই। আপনারা সকলেই জানেন, তারা আমাদের কাউকেই ছেড়ে দেবে না। তারা অসদুপায়ে ও ঘৃণ্য পন্থায় রাতদিন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। আল্লাহর কাছে কামনা, তিনি যেন তাদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে তাদেরকেই ফেলেন এবং সকল মুসলমানকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন।

পরিশেষে বলব, আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা আমরা মানুষের জন্য সহজ করবো। যদি কোন ব্যক্তি আন্দোলনের মৌলিক উদ্দেশ্য ও মূলনীতির সাথে একমত হয়ে যায়, এবং সে নিজেকে কোন বিশেষ মজমুআর কাছে অর্পণ করে, তাহলে তার উপর অতটুকই বোঝা চাপানো যায় যতটুক সে বহন করতে পারে।

বেশি করার শক্তি থাকলে সুন্দরভাবে উৎসাহ দেয়া যাবে।। কিন্তু এটা মোটেও উচিৎ হবে না, যদি আমাদের থেকে মানুষ এই পয়গাম পায় যে- 'সংগঠন ও আন্দোলন শুধু তাকেই কবুল করে, যে তার সবকিছু ছেড়ে সংগ্রামে যোগ দেয়। যার মধ্যে এই হিম্মত নেই তার এখানে কোন কাজ নেই।'

যে যতটুক সাথে থাকতে পারে শুকরিয়ার সাথে গ্রহণ করা হবে। সুতরাং সবকিছু আল্লাহর জন্য কুরবানি করার উৎসাহ দেয়া ভিন্ন বিষয়। আর এটা দরকারও। কিন্তু যে সামান্য পরিমাণে সাথে থাকে তাকে বেশি পরিমাণে সাথে থাকায় বাধ্য করা মোটেও ভালো কাজ নয়।

দাওয়াত হোক, আন্দোলন হোক, দাঈর নিজের তরবিয়ত হোক, কোন একটি ভালো জামাতের সাথে যুক্ত অনুগত থাকা জরুরি। দাওয়াত প্রদানকারীরা নিজেরাও ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী নেতসদের সাথে আমলিভাবে যুক্ত থাকবে। অন্যদেরকেও যুক্ত করার চেষ্টা করবে। জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে কাজ করায় অনেক ক্ষতি আছে। এটা মোটেও ভালো কাজ না।

পাশাপাশি, দীর্ঘমেয়াদী বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে গেলে কোনো জামা'আত দ্বারা ভালো কোন ফল আশা করা যায় না। তাদের থেকে আলাদা হওয়াটা ইসলামের সেসব ভাষ্যের পরিপন্থী নয়, যেখানে জামা'আহবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, জামাআবদ্ধ থাকার অর্থ শুধু সংখ্যাবৃদ্ধি বা একত্রিত হওয়া নয়। ইসলামে জামা'আহটা মৌলিক স্বতন্ত্র কোন উদ্দেশ্য নয়।

বরং জামা'আর উদ্দেশ্য হলো: সমষ্টিগতভাবে আল্লাহর হুকুম কায়েম করা। এর মধ্যে জিহাদ ফি সাবিলিলিল্লাহও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কোন জামা'আহ দ্বারা যদি আল্লাহর হুকুম পালন না হয়, বরং এই জামা'আহটাই আল্লাহর হুকুম পালনের পথে বাধা হয়, তাহলে এই সংঘবদ্ধতা কখনোই কাম্য নয়। বরং পরিত্যাজ্য।

অধিকন্তু ইসলামে জামা'আহ বলতে সেই জামা'আতই উদ্দেশ্য, যা দ্বারা আল্লাহর হুকুম কায়েম হয় বা আল্লাহর হুকুম পালনে একে অপরের প্রতি সহযোগিতা হয়। এক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. এর উক্তিটি সামনে রাখা যেতে পারে। জামা'আর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন-

"জামা'আহ তো সেটাই; যেটা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও তার সদস্য মাত্র একজন হয়।"

জামা'আহর ব্যাপারে এই ইলমী বুঝ না থাকার কারণে আজ উম্মাহর অনেক সন্তানদের পরিশ্রমগুলো অপাত্রে ব্যবহার হচ্ছে। তারা না বুঝে এমন জামা'আহকে ধরে রেখেছে, হকের সাথে যাদের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। অথচ তারা মনে করছে, এই জামা'আহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তারা অপরাধী হয়ে যাবে। আর জামা'আহর নেতারাও জামা'আহবদ্ধ হবার ইসলামী নির্দেশগুলো তাদের সামনে তুলে ধরছে। কিন্তু জামা'আহর আসল উদ্দেশ্য ও পরিচয় তাদের থেকে গোপন করছে।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাওফীকের পর বলবো- আমার এই অতি ক্ষুদ্র বয়সে দেখেছি, সর্বদা আমাদের আগ্রহ থাকতে হবে যেন আমাদের সকল মেহনত এবং শ্রম আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়। ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুরাই যেন সবসময় আমাদের প্রতিপক্ষ থাকে।

কোন মু'মিনকে, ইসলামী কোনো দলকে আমরা কখনোই প্রতিপক্ষ বানাবো না। মুসলিম ভাইদের সাথে কখনোই অযথা তর্কে জড়াবো না। তাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করবো না। ইসলামী সব দলের সাথে আমাদের থাকবে সমঝোতা, সহমর্মিতার সম্পর্ক। থাকতে হবে নিয়তের বিশুদ্ধতা। তবে এই সকল বিষয় সম্পাদিত হবে পরামর্শের মাধ্যমে। কারো একক সিদ্ধান্ত আমরা চাপিয়ে দিবো না। এর উপকারিতা এবং এটা না মানার ক্ষতি উম্মত অনেকবারই প্রত্যক্ষ করেছে।